সংবাদ
05 DEC 2002

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বমান উন্নয়ন প্রসঙ্গে কিছু কথা

ড. গোলাম মোহাম্মদ ভূঞা

> যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একদিন প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত ছিল, তার সে খ্যাতি আজ ক্রমশই হারিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষা ও গবেষণার মান ক্রমাবনতির কারণে বিশ্বমানের দিক থেকে দিন দিন পিছিয়ে পড়ছে। সমগ্র পৃথিবী দূরের কথা এশিয়ার ৫০টি নাম করা প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম আজ ঠাঁই পাচ্ছে না; কিন্তু এ পিছিয়ে পড়া বা মানের অবনতি কারও কাম্য নয়; বরং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বমান উন্নতি হয়ে এশিয়ার সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হোক এটাই সবার কাম্য। দেশের অনেক সচেতন নাগরিক এটা উপলব্ধি করে দৈনিক পত্রিকাগুলোতে এ ব্যাপারে লেখালেখি করছেন। এ প্রসঙ্গে দু'টি প্রশ্নের উত্তর জানা আজ সময়ের দাবি, যা উপেক্ষা করার কোন উপায় নেই।

উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে অধ্যয়নের সময় কেন জানি আমার পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করার আগ্রহ হলো। পরীক্ষা পাসের পর আমার অধিকাংশ বন্ধু-বান্ধবই ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হলো। আমি ওইদিকে না গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র হলাম। অনার্সসহ এমএসসি শেষ করতে চার বছরের জায়গায় আট বছর লেগে গেল। তারপর একদিন এখানে শিক্ষকতা শুরু করলাম। এভাবে ছাত্র এবং শিক্ষক হিসেবে বাইশটি বছর অতিবাহিত হয়ে গেল। যে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমার মন ও প্রাণ নিবিড়ভাবে জড়িত এর উন্নতি দেখলে আনন্দে মন যেমন ভরে ওঠে, তেমনি এর অবক্ষয় বা অবনতি দেখলে বিষাদে মন ভারাক্রান্ত হয়।

যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একদিন প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত ছিল, তার সে খ্যাতি আজ ক্রমশই হারিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষা ও গবেষণার মান ক্রমাবনতির কারণে বিশ্বমানের দিক থেকে দিন দিন পিছিয়ে পড়ছে। সমগ্র পৃথিবী দূরের কথা এশিয়ার ৫০টি নাম করা প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম আজ ঠাঁই পাচ্ছে না; কিন্তু এ পিছিয়ে পড়া বা মানের অবনতি কারও কাম্য নয়; বরং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বমান উন্নতি হয়ে এশিয়ার সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হোক এটাই সবার কাম্য। দেশের অনেক সচেতন নাগরিক এটা উপলব্ধি করে দৈনিক পত্রিকাগুলোতে এ ব্যাপারে লেখালেখি করছেন। এ প্রসঙ্গে দু'টি প্রশ্নের উত্তর জানা আজ সময়ের দাবি, যা উপেক্ষা করার কোন উপায় নেই। প্রশ্ন দু'টি হলো (১) শিক্ষা ও গবেষণার মান দিন দিন অবনতি হচ্ছে কেন? এবং (২) সকল সীমাবদ্ধতার মাঝেও কিভাবে এ অবক্ষয় রোধ করা সম্ভব? এ দু'টি প্রশ্ন নিয়ে আজকের এ লেখা।

একটি সাধারণ বিদ্যালয় এবং পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মৌলিক তফাৎ কি, আমরা আজ তা ভুলতে বসেছি। একটি বিদ্যালয় শিক্ষাদানের পবিত্র স্থান, যেখানে গুণি শিক্ষকগণ শিক্ষা প্রদান করেন এবং ছাত্রছাত্রীরা তা গ্রহণ করে। এভাবে ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞানার্জনে আগ্রহী করে তোলা বিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্য। একটি পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শুধু শিক্ষা প্রদান নয়; বরং জ্ঞানের চর্চা করাই মূল উদ্দেশ্য। এখন প্রশ্ন হলো জ্ঞানচর্চা বলতে কি বুঝি? জ্ঞানের সাধনা, গবেষণা ও আদান-প্রদান এ সবগুলোর একত্রিত ফলাফল হলো জ্ঞানার্জন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র শিক্ষকের কাজ থেকে এবং শিক্ষক ছাত্রের গবেষণালব্ধ ফলাফল, সুচিন্তিত অভিনব মতামত এবং ধারণা থেকে নতুন জ্ঞান আহরণ করবে। এভাবে জ্ঞানের আদান-প্রদান হবে। সুতরাং এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বমান জ্ঞান চর্চার উৎকর্ষতার ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। এখন এটি স্পষ্ট যে, উপরোল্লিখিত প্রথম তিনটি শব্দ (সাধনা, গবেষণা, জ্ঞানের আদান-প্রদান) বাদ দিলে একটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং একটি সাধারণ রিদ্যালয়ের মধ্যে আর কোন পার্থক্য থাকে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ও জ্ঞানচর্চার মানের ক্রমাবনতির দিকে গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে বোঝা যায়, এটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্খলিত হয়ে ক্রমশ সাধারণ বিদ্যালয়ে পরিণত হতে যাচ্ছে।

আমার ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বমান অবক্ষয়ের জন্য দায়ী প্রধান কারণগুলো হলো ঃ

(ক) শিক্ষকদের বর্তমান বেতন-ভাতা অপর্যাপ্ত।

(খ) শিক্ষক ও ছাত্র রাজনীতি।

(গ) অনেক ক্ষেত্রে যোগ্যতর ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে কম যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ।

(ঘ) যোগ্যতার সার্বিক যাচাই না করে পদোন্নতি প্রদান।

(ঙ) গবেষণায় অর্থায়নের অভাব।

(চ) গবেষণা ও জ্ঞানচর্চায় ব্রত নিষ্ঠাবান শিক্ষকের সঠিক মূল্যায়ন না হওয়া ইত্যাদি।

আমি যে কারণগুলো দাঁড় করালাম তার কোনটাই নতুন নয়। অনেকের লেখায় এবং বক্তৃতায় এগুলো প্রায়ই উচ্চারিত হচ্ছে। এ কারণগুলো কিভাবে বিশ্বমানের অবক্ষয় ঘটাচ্ছে— এ সম্পর্কে কিন্তু কেউ সুনির্দিষ্টভাবে বলেন না। যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি থেকে শুরু করে অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তির মুখে বিভিন্ন সেমিনার বা সভায় একটি কথা প্রায়ই শোনা যায়। একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য আমাদের তৈরি হতে হবে। যদি বক্তৃতার শেষে প্রশ্ন করা হয়, একুশ শতকের চ্যালেঞ্জগুলো কি কি? কিভাবে মোকাবিলা করতে হবে? তবে কত জনের কাছ থেকে এর সদুত্তর পাওয়া যাবে, তা বলা মুশকিল। যাহোক, আমার দৃষ্টিতে বিশ্বমানের অবক্ষয় রোধ করা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একুশ শতকের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। আর এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হলে প্রথমেই জানতে হবে কিভাবে বিশ্বমানের অবক্ষয় ঘটছে। এ প্রসঙ্গে (আমার ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে) প্রধান কয়েকটি কারণ সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

(ক) শিক্ষকদের বর্তমান বেতন-ভাতার অপর্যাপ্ততা ঃ

জ্ঞানচর্চার জন্য প্রথমেই দরকার সুস্থ মন যা দৈনন্দিন, সাংসারিক প্রয়োজনের বৈষয়িক চিন্তামুক্ত। উন্নত দেশে একটি কথা প্রচলিত আছে, জ্ঞানের উৎকর্ষতার জন্য দরকার FF (Freedom and Fund)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক একটি মধ্যবিত্ত জীবনের নকশা মনে এঁকেই এ পেশায় আসেন। ইচ্ছা করলে এরা বিশেষ করে বিজ্ঞানের শিক্ষকগণ অন্য যেকোন পেশায় যেতে পারতেন। [illegible] একজন প্রভাষক যে পরিমাণ বেতন-ভাতা পেয়ে থাকেন, তা দিয়ে ঢাকা শহরে দু'জনের একটি ছোট সংসার স্বচ্ছলভাবে চালানো সম্পূর্ণ অসম্ভব। চৌদ্দ-পনের বছর পর যখন অধ্যাপক হন, তখনও তার বেতনে চার সদস্যের একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের স্বচ্ছলতা আসছে না। তাই অনেকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও খণ্ডকালীন শিক্ষকতা বা কনসালটেন্সি বা অন্য কোন খণ্ডকালীন কাজ বেছে নেন। ফলে সময়ের অভাবে জ্ঞানচর্চা বিঘ্নিত হয় এবং ক্রমশ জ্ঞানচর্চার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রতিবেশী দেশ ভারত ও পাকিস্তানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন-ভাতার চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভারত ও পাকিস্তানে শিক্ষকদের বেতন-ভাতা সকল স্তরে আমাদের তুলনায় যথাক্রমে দুই এবং তিনগুণ বেশি। এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ দুই দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(খ) শিক্ষক ও ছাত্র রাজনীতি ঃ

বিভিন্ন পত্রপত্রিকা দেখলে সহজেই চোখে পড়ে যে, ঐতিহ্যবাহী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক দলীয় রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত হয়ে পড়েছেন। এমনকি রাজনৈতিক দলের নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিভিন্ন ফোরাম গঠন করছেন। এদের অনেকের চিন্তা, চেতনা, জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার মূলনীতি থেকে অনেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। দলীয় স্বার্থরক্ষার মাধ্যমে রাজনৈতিক নেতাদের অনুগ্রহ পেয়ে নিজের স্বার্থসিদ্ধ করাই আজ মূল উদ্দেশ্য হয়ে পড়েছে। সরকারিদলের দলীয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িত শিক্ষকগণ (যোগ্যতা থাকুক বা না থাকুক) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য বা কোষাধ্যক্ষ অথবা সরকারি উচ্চ পদ দ্বারা পুরস্কৃত হচ্ছেন। ফলে একটি অভিযোগ প্রায়ই শোনা যাচ্ছে যে, অনেক শিক্ষক দলীয় রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকায় গবেষণা তো দূরের কথা ক্লাসে শিক্ষাদানের ব্যাপারেও অমনোযোগী হয়ে পড়েছেন। ব্যাপারটি হতাশাব্যঞ্জক হলেও সত্য যে, ক্যাম্পাসে শিক্ষকদের যাতায়াতের বাসে, লাউঞ্জে বা অফিসে দু'জন শিক্ষক গবেষণা কর্ম বা কোন অ্যাকাডেমিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন এমন ঘটনা চোখেই পড়ে না; বরং দলীয় রাজনীতির কথাবার্তাই মুহুর্মুহু শোনা যায়। অন্যদিকে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখেছি ক্যাম্পাসে এমনকি কেন্টিনের খাবার টেবিলে দু'জন শিক্ষকের দেখা হলে নিজ নিজ গবেষণা কর্মের ফলাফল ও সমস্যা নিয়েই অধিকাংশ আলোচনা করে থাকেন। তাহলে এটি স্পষ্ট যে, শিক্ষক সমাজকে জ্ঞানচর্চা বিমুখী করার জন্য শিক্ষক রাজনীতি বহুলাংশে দায়ী। আর এর পরিণাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বমানের অবনতি।

আপনারা অনেকে হয়ত আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, গত কয়েক দশক ধরে ভয়াবহ ছাত্র রাজনীতি অনেক ছাত্রছাত্রীদের সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ বানিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে বিশেষ করে হলগুলোয় এ সন্ত্রাসীদের অবস্থান সাধারণ ছাত্রছাত্রীর্দের জন্য এক অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি করে আসছে। অনেক মেধাবী ছাত্রদের জোর করে মিছিলে নিয়ে লেখাপড়ার ক্ষতি করা হচ্ছে, কেউ অনিহা প্রকাশ করলে নির্যাতিত হয়েছে, এরকম কথা শোনা যায়। এ তথাকথিত ছাত্রনেতাদের মূল খুব গভীরে অর্থাৎ সরকারি বা বিরোধীদলের বড় বড় নেতার সঙ্গে এদের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে বলে অভিযোগ আছে। ফলে এ ছাত্ররা শিক্ষকদের কোন তোয়াক্কা করে না। এদের ইচ্ছামাফিক প্রশাসন না চালানোর কারণে অনেকসময় অনেক শিক্ষককে হেয়প্রতিপন্ন হতে হয়েছে। এভাবে ছাত্র শিক্ষকদের সুসম্পর্ক বিনষ্ট হয়ে আসছে, যা অ্যাকাডেমিক উৎকর্ষতার পরিপন্থী। শুধু তাই নয়, দলীয় স্বার্থের জন্য ছাত্রনেতারা কারণে অকারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ করে দেয়। ফলে বিপর্যস্ত হয় জ্ঞানচর্চা কার্যক্রম।

(গ) যোগ্যতার সঠিক বিচার না করে দলীয়ভাবে শিক্ষক নিয়োগ এবং নির্দিষ্ট পদের যোগ্যতা অর্জনের আগেই পদোন্নতি প্রদান ঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানচর্চা, শিক্ষাদান ও সৃজনশীল গবেষণায় মেধার কোন বিকল্প নেই। কেবল মেধাবীদের দ্বারাই জ্ঞান-বিজ্ঞানে নতুন ধ্যান-ধারণা ও সৃজনশীল গবেষণা কর্ম সংঘটিত হতে পারে। সুতরাং দলীয় রাজনীতির কারণে অনেক সময় যোগ্যতার আবেদনকারীকে বাদ দিয়ে অপেক্ষাকৃত অযোগ্য ব্যক্তি শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাচ্ছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। যদি তাই হয়, তবে স্বভাবতই শিক্ষার মান নিম্নমুখী হবে। এখানেই এর শেষ নয়। এ শিক্ষকগণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকেই দলীয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন এবং দলীয় রাজনীতির অশুভ সিঁড়ি ধরে গবেষণা কর্ম ছাড়াই পদোন্নতি পেতে চান এবং বেশিরভাগ সময় পেয়েও থাকেন। নিচের ঘটনা থেকে ব্যাপারটি আরও বেশি উপলব্ধি করা যাবে। কিছু দিন আগে হলের প্রাধ্যক্ষ ও আবাসিক শিক্ষকদের এক সভায় এক প্রাধ্যক্ষ প্রস্তাব রাখেন, আবাসিক শিক্ষকদের প্রতিবছর সার্ভিস দেয়ার জন্য একটি পয়েন্ট প্রদান করতে হবে। এর বিনিময়ে দশ বছর সার্ভিসের পর একজন শিক্ষক কোন গবেষণা কর্মকাণ্ড ছাড়াই হয়ত অধ্যাপক হয়ে যাবেন। এখন ভেবে দেখুন, একজন রাজনৈতিক শিক্ষকের মানসিকতা আজ কোন্ পর্যায়ে এসে পড়েছে। জ্ঞানচর্চার সম্পূর্ণ বিপরীতে নয়কি! যাহোক, কিছু শিক্ষকের আপত্তির জন্য শেষ পর্যন্ত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়নি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকদের পদোন্নতির ব্যাপারে কিছু নির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। যেমন প্রভাষক থেকে সহকারী অধ্যাপক, সহকারী থেকে সহযোগী এবং সহযোগী থেকে অধ্যাপক পদে উন্নীত হতে (ন্যূনতম পক্ষে) যথাক্রমে তিন, সাত এবং পনেরটি প্রকাশিত গবেষণাপত্র থাকতে হবে। এগুলো আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন জার্নালে প্রকাশের কথা রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, গবেষণা প্রবন্ধ যত্রতত্র ছাপিয়ে আনতে পারলেই হলো, সোজা পদোন্নতি। গবেষণা বা প্রবন্ধের মান সঠিকভাবে যাচাই করা হয় না। লোকাল এবং আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধের মান সমান ধরা হয়। কথায় আছে, যে দেশে তেল ও ঘি একই মূল্যে বিক্রয় হয়, সে দেশে ন্যায় বিচার নেই। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়েও একই অবস্থা। এ ব্যবস্থায় জ্ঞানচর্চায় অনুরাগী শিক্ষকও বিরাগী হয়ে পড়েন। কারণ গুণগত মানসম্পন্ন গবেষণাপত্র প্রকাশ করতে সময় ও শ্রম অনেক বেশি ব্যয় করা সত্ত্বেও তার মুল্যায়ন পাচ্ছেন না। অনেকক্ষেত্রে এরকম অভিযোগ শোনা যায় যে, সবচেয়ে কমযোগ্য প্রার্থী যার ন্যূনতম সংখ্যক (এমনকি লোকাল জার্নালে প্রকাশিত) গবেষণাপত্র নেই, তাকে স্থায়ী পদে নিযুক্ত করে পুরস্কৃত করা হয় এবং যোগ্যতর ব্যক্তিকে পদ পুনর্গঠনের মাধ্যমে পদোন্নতি দেয়া হয়। যদি তাই হয়, তবে দু'দিক থেকে ক্ষতি হবে। অযোগ্য লোকটি গবেষণার মূল্য কখনও উপলব্ধি করবে না এবং ছাত্রছাত্রীদের কখনও উৎসাহিত করতে পারবেন না। অন্যদিকে যোগ্য লোকটি জ্ঞানচর্চায় নিরুৎসাহিত হবেন। এভাবে পদোন্নতি প্রদান বিশ্বমান উন্নয়নে পরিপন্থী ভূমিকা পালন করবে— এটাই স্বাভাবিক।

(ঘ) গবেষণায় অর্থায়নের অভাব ঃ

কার্যকরী গবেষণা ব্যতীত অ্যাকাডেমিক বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল উন্নয়ন যেমন কল্পনা করা যায় না, তেমনই অর্থায়ন ব্যবস্থা ছাড়া গবেষণা করাও অকল্পনীয়। মাসকয়েক আগে পাকিস্তানে এক কনফারেন্সে যোগদান করেছিলাম। সেখান থেকে জানতে পারলাম কয়েক বছর আগে পাকিস্তানের গবেষণা বাজেট দু' মিলিয়ন রুপি থেকে বৃদ্ধি করে ছয় শ' মিলিয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে এটি জিডিপি এর দু' শতাংশতে স্থির করার চিন্তাভাবনা চলছে। গবেষণার ক্ষেত্রে এর প্রতিফলন দেখতে পেলাম। পাকিস্তানি বিজ্ঞানিগণ অর্থায়নের ফলে এরকম কিছু গবেষণা কর্ম শুরু করেছেন, যা উন্নত বিশ্বের বিজ্ঞানীদের আজকের চ্যালেঞ্জ। পাকিস্তানের এ পদক্ষেপ দেখে আমার খুব ভাল লাগল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অর্থায়নের অবস্থা দেখে খারাপ লাগল। মৌলিক গবেষণায় আমরা পাকিস্তানের মতো বড় ধাপ নিতে না পারলাম, একটি ছোট ধাপও কি নিতে পারি না। শুনে হয়ত আশ্চর্য হবেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই ভাল সায়েন্টিফিক জার্নাল ও অন্যান্য গবেষণার উপকরণ অর্থাভাবে ক্রয় করা সম্ভব হচ্ছে না। এ দু' বস্তু ছাড়া জ্ঞানচর্চার উন্নতি করা খুবই দুরূহ ব্যাপার।

(ঙ) কিভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বমান অবক্ষয় রোধ করা সম্ভব ঃ

এক কালের প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনতে হলে এর বিশ্বমান উন্নয়ন করা ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। তবে আমরা আজ যে পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছি ওই কাজটি সহজসাধ্য নয় এবং রাতারাতি করাও সম্ভব নয়। তবে এ উদ্দেশ্য অতি তাড়াতাড়ি যে কাজটি প্রথমে করা প্রয়োজন, তা হলো বিশ্বমানের অবক্ষয় রোধ করার ব্যবস্থা করা। এ ব্যাপারে আমার কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব আছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এগুলোর বাস্তবায়ন হলে [illegible] না হলেও খুব দ্রুত অবক্ষয় রোধ করা সম্ভব হবে।

জমি চাষাবাদ না করলে সেখানে আপনা আপনি আগাছা জন্মাবে, এজন্য কোন পরিকল্পনা বা যত্ন প্রয়োজন হয় না। আস্তে আস্তে আগাছা যখন বড় হয়ে জঙ্গল সৃষ্টি করবে, তখন সেখানে বিষাক্ত সাপ ও অন্যান্য হিংস্র জীবের আস্তানা হবে, এটিই স্বাভাবিক। তেমনিই বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানচর্চার উৎকর্ষতা লাভের ঐকান্তিক চেষ্টা ও সাধনা না থাকলে সেখানেও আগাছা জন্মাবে। অর্থাৎ লেজুড়বৃত্তি কারক রাজনৈতিক শিক্ষক ও ছাত্র এবং জ্ঞানচর্চা বিমুখী ব্যক্তিত্ব তৈরি হবে। অনেকে শিক্ষক রাজনৈতিক দলের নামের সঙ্গে মিলিয়ে বিভিন্ন ফোরাম গঠন করবে, নিরপেক্ষ তরু শিক্ষকের নাম দিয়ে দলীয় রাজনৈতিক সেমিন অনুষ্ঠিত করবে, এটি আশ্চর্যের কিছু নয় জ্ঞানচর্চার পরিবেশকে পুনরায় ফিরিয়ে আনতে পারলেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগাছা দূর হবে, বিশ্বমানের উন্নতি হবে, এটাই আমার বিশ্বাস। সমস্যা জড়িত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল সীমাবদ্ধতার ভেতরে থেকেও কিভাবে জ্ঞানচর্চার পরিবেশ ফিরিয়ে আনা যায় নিম্নের প্রস্তাবগুলোর এটিই মূল্য লক্ষ্য।

(১) রাজধানী ঢাকা মধ্যে সবচেয়ে ব্যয়বহুল শহর। মফস্বল শহরের তুলনায় এখানে দৈনন্দিন ব্যয় অনেকগুণ বেশি। কাজেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একটি পৃথক বেতন স্কেল থাকা উচিত, যা একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের ব্যয় বহনের জন্য পর্যাপ্ত। এ ব্যাপারে প্রতিবেশী দেশ ভারত ও পাকিস্তান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। যতদিন পর্যন্ত নতুন বেতন স্কেল বাস্তবায়ন না হবে, ততদিন পর্যন্ত শিক্ষকদের একটি ভাল অঙ্কের ভাতা প্রদান করতে হবে।

(২) বর্তমান শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতি কিছুটা পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করতে হবে। কোন পদ্ধতিই ১০০% নিখুঁত নয়। তবু আমাদের এমন একটি পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে, যাতে ত্রুটির পরিমাণ সর্বনিম্ন হবে। অ্যাকাডেমিক ফলাফল ও গবেষণা কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে দরখাস্তকারীদের মধ্যে যিনি বেশি যোগ্য বিবেচিত হবেন শুধু তাকেই নির্বাচিত করতে হবে। এর কোন ব্যতিক্রম হতে পারবে না। এখানে বিভিন্ন অ্যাকাডেমিক ফলাফলের জন্য বিভিন্ন পয়েন্ট নির্ধারিত থাকবে। প্রকাশিত গবেষণা পত্রের জন্যও পয়েন্ট নির্ধারিত থাকবে। যার পয়েন্ট বেশি হবে সে-ই যোগ্যতর বিবেচিত হবে। ফলে দলীয় বা স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত অযোগ্য শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ হবে।

(৩) বর্তমান অবস্থায় বাংলাদেশের লোকাল জার্নালগুলোয় প্রকাশিত প্রবন্ধের আন্তর্জাতিক মান শূন্য। কাজেই শুধু লোকাল জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা কোনক্রমেই জ্ঞানচর্চা বা গবেষণার উৎকর্ষতার পরিমাপক হতে পারে না। সহকারী অধ্যাপক থেকে শুরু করে ওপরের পদে নিয়োগ বা পদোন্নতির পুনর্গঠনে যোগ্যতা যাচাইয়ের পদ্ধতির কিছু পরিবর্তন করতে হবে। বর্তমান নিয়মে প্রভাষক থেকে সহকারী, সহকারী থেকে সহযোগী এবং সহযোগী থেকে পূর্ণ অধ্যাপক পদে উন্নতি করতে যথাক্রমে (ন্যূনতম পক্ষে) তিন, সাত ও পনেরটি প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধ থাকার কথা আছে। এক্ষেত্রে আমি কিছু বিষয় সংযোজন করতে চাই। কোন গবেষণা প্রবন্ধের এক্সেপটেন্স লেটার থাকলেই সংখ্যা গণনায় গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে গ্যালি প্রুফ থাকলে গ্রহণ করা যেতে পারে প্রকাশিত গবেষণাপত্রের দুই-তৃতীয়াংশ অবশ্যই আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন জার্নালে হতে হবে। ন্যূনতম সংখ্যার কমপক্ষে অর্ধেক প্রবন্ধে প্রার্থিত ব্যক্তি প্রথম লেখক হিসেবে থাকতে হবে। অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন যে, আন্তর্জাতিক জার্নাল চেনার উপায় কি? বর্তমান কম্পিউটার যুগে এটা জানা খুবই সহজ। জার্নালের মান নির্ণয়ে ইম্পেক্ট ফ্যাক্টর নামে একটি সূচক আছে। যে সকল জার্নালের এ সূচক শূন্য নয় এবং সম্পাদকীয় বোর্ডে আন্তর্জাতিক সদস্য উপস্থিত তাদেরকেই শু আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন জার্নাল বলা হবে। এ ব্যতিক্রম হলে তাদের লোকাল জার্নাল হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। ব্যাপারটি চরম দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ এমন অনেক শিক্ষক অধ্যাপক হয়ে গেছেন যাদের আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন জার্নালে একটি গবেষণা প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়নি। আরও পরিতাপের বিষয় যে, এমনকি অনেকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোকাল জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধ ছাড়াই পদোন্নতি পেয়ে গেছেন। উল্লেখ্য যে, বাংলা সাহিত্যের মতো কি বিষয়ে হয়ত আন্তর্জাতিক জার্নাল নেই। এ ক্ষেত্রে পদোন্নতি প্রার্থীর লিখিত বই বা গবেষণা প্রবন্ধগুলো ওই বিষয়ে ব্যতিক্রমী বিদেশী কোন রেফারির দ্বারা মূল্যায়ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। রেফারির মতামত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

(৪) ন্যূনতম যোগ্যতা অর্জন ব্যতিরেকে কারও পদোন্নয়ন করা যাবে না। নিয়োগ কমিটি শুধু যোগ্যতা যাচাই করবেন, শর্ত শিথিল করতে পারবেন না।

(৫) জ্ঞানচর্চায় ব্রত এবং উত্তম গবেষণাকারী শিক্ষকের যথার্থ মূল্যায়ন করে তার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে দিতে হবে, যাতে প্রকৃত জ্ঞানচর্চায় সবাই উৎসাহিত হয়।

(৬) উন্নত দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পাঠদান যোগ্যতা আনুষঙ্গিক ছাত্র দ্বারা মূল্যায়নের ব্যবস্থা করতে হবে। ফলে শিক্ষকরা পাঠদানে অধিকতর মনোযোগী হবেন।

[লেখক ঃ অধ্যাপক পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়]।